

পূর্ব ডুয়ার্সের সামাজিক পরিবেশ ও তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাস

দীপিকা বাড়ই

সারসংক্ষেপ:

জীবন সম্পর্কে লেখকের মনের অনুভব বা অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির কথাই হল সাহিত্য। আর লেখকের এই অনুভব বা উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিরাট জায়গা নিয়ে রয়েছে তার চারপাশের পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা। কেননা মানুষ কখনোই প্রকৃতি ও পরিবেশ ভিন্ন নয়। ফলত লেখকের মনোভাব বা মননের বিকাশে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাহিত্যের অন্যতম শাখা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও একটি অন্যতম উপাদান পরিবেশ বা পটভূমি বা অঞ্চল। সমালোচকেরা সময়ের প্রবাহমানতায় উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এই পরিবেশের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেও এবং জীবনজিজ্ঞাসা বা জীবনবোধ প্রকাশ করাকে মূলকথা মনে করলেও, পরিবেশের ভূমিকা একেবারে ফেলনা নয়। বরং পরিবেশ নির্বাচন এবং উপস্থাপন কৌশল একজন লেখকের নিজস্বতাকে স্পষ্ট করে। যার শিল্পীত্ব প্রয়োগ শিল্পকর্মটিকে নির্দিষ্ট স্থান, কালের হয়েও কালোত্তীর্ণ স্তরে পৌঁছে দেয়।

বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। তিনি জন্মসূত্রে উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চল ডুয়ার্সের কালচিনি চা বাগান ব্লক এলাকার নিবিড় স্পর্শ লাভে বেড়ে উঠেছেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার বাসিন্দা হলেও শৈশব, কৈশোর, তারুণ্যের কাটানো দিনগুলিতে গাছ-পালা, ছোট-বড় অসংখ্য নদী-ঝোরা, পাহাড়-অরণ্য, পশু-পাখি, জীব-জন্তু ইত্যাদি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ যে ডুয়ার্স অঞ্চলকে দেখেছেন তার নিবিড় প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর প্রথম দিককার রচিত উপন্যাসগুলিতে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে বিশেষত পূর্ব ডুয়ার্সে (যার সীমানা তোর্ষা নদী থেকে আসাম ঘেঁষা সংকোশ নদী পর্যন্ত) এমন অনেক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে, যারা যুগ যুগ ধরে শত বাধা-বিপত্তি, পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতিকূলতা, পরিবর্তনের মধ্যেও স্বজাতির পরম্পরাগত রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, ভাষাচর্চা ইত্যাদির নিরিখে জীবনধারণ ও জীবনযাপন করে চলেছে। তাদের যাপিত এই জীবনে জড়িত প্রকৃত-লগ্ন আদিম সমাজের বিভিন্ন উপকরণ, যা এখনো তার কুমারিত্ব বা মৌলিকতা হারায় নি কিংবা ‘অন্য’ সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে মিশে যায় নি, তাকে কোম বা আদিম জনজাতির উপাদান বলা হয় যা তাঁর উপন্যাস থেকে বাদ যায় নি। এই অঞ্চলের বিচিত্র উপাদান নিয়ে রচিত হয়েছে তাঁর আখ্যানবিশ্ব এবং আখ্যানসূত্রে পাওয়া যায় নতুন জীবনের দ্রাণ। তিনি কীভাবে এবং কেমন করে ডুয়ার্সের এই সামাজিক পরিবেশকে উপন্যাসে তুলে এনে শৈল্পিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তা অনুসন্ধান করাই এই গবেষণা-নিবন্ধের মুখ্য বিষয়।

মুখ্য শব্দ: কোম—জনগোষ্ঠী, গিরমিটিয়া-চুক্তিবদ্ধ কর্মী, কন্দ—খাবার বিশেষ, পিলুয়া—চা গাছের ক্ষতিকারক কীট, কুকরি—মাটি খোঁড়ার যন্ত্র, ফারুয়া—কোদাল, তবল—কুঠার, ডিববি—কুপি, টোকরি—পাত্রবিশেষ, পোস্তি—খাবার বিশেষ (গরম ভাতে জল ঢেলে কাঁচকলা মেখে খাওয়া)।

মূল প্রবন্ধ:

যে কোনো লেখক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজস্ব উপলব্ধিজাত জীবনজিজ্ঞাসা, জীবনদর্শনের কথা বলতে চান, যার শিল্পিত রূপ রচনা করার জন্য লেখক ঘটনা, সংলাপ, চরিত্রের আশ্রয়ে বাস্তবের মাটি থেকে রসদ খোঁজেন, সেই সূত্রে রচনারীতিতে দেখা যায় নানা প্রকরণের বিস্তার ও বিন্যাস—দৃষ্টিকোণ, চরিত্র-পরিকল্পনা, সময়-ভাবনা, ভাষারীতি, কথনভঙ্গি-সহ সাহিত্য-সৃষ্টির রামধনু আকাশ, অনিশেষ প্রকৃতি-পরিবেশের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ থেকে বিস্তার। যার জল-হাওয়ার রসদ নিয়ে ঘটনা বা কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি উপাদান পুষ্টি লাভ করে এবং জন্ম দেয় আধুনিক জীবনের মহাকাব্য স্বরূপ উপন্যাস এবং তারই খণ্ড রূপ ছোটগল্প। যে কারণে অঞ্চল বা স্থান বা পটভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে সময়ের অভিঘাতে উপন্যাস স্রষ্টার ‘চিন্তারাজমূলক বৃক্ষে’ এর গুরুত্ব নিয়ে নানা মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে, প্রাধান্য পেয়েছে জীবনজিজ্ঞাসা, মনোভূমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অঞ্চল বা স্থান বা পটভূমি অনেক সময় তুচ্ছ মনে হলেও একেবারে ফেলনা নয়। এর গুরুত্ব অপিরিসীম। পটভূমি নির্বাচন ও উপস্থাপন নৈপুণ্য লেখকের ব্যক্তিত্বে নিজস্বতা দান করে। সুকৌশলী লেখকেরা পটভূমি নির্বাচন এবং উপস্থাপন কৌশলের মাধ্যমে তাকে স্থান-কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়ে সূক্ষ্ম জীবনদর্শনের উপলব্ধিতে নিয়ে যায় এবং তা সর্বজনীন মাত্রা পায়। ফলত বিশিষ্ট সমালোচক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় ‘সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’ গ্রন্থে বলেছেন :

‘একটি নির্দিষ্ট সময়-কাঠামোয়, একটি প্রাকৃতিক ভৌগোলিক-সামাজিক প্রেক্ষিতে কাহিনি রূপবদ্ধ হয়, পাত্র-পাত্রীরা ক্রম-বিকশিত হতে থাকে। প্রতিবেশ বা ‘milieu’ পটভূমির বস্তুগত তাৎপর্যকে অতিক্রম করে এক বিশদ ও গভীর প্রেক্ষাপটের ইঙ্গিত দেয় ঘটনা ও চরিত্রের শেকড় থাকে পটভূমি বা প্রতিবেশের মাটিতে।’

এই তাৎপর্যের পটভূমি স্বরূপ অঞ্চল বা স্থান বা সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উপন্যাস বা ছোটগল্পের একটি উপাদান রূপে কালে কালে উপস্থাপিত হয়েছে। যার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে আমরা বহু পেয়েছি। সেই সূত্র ধরে আমরা উত্তরবঙ্গের এককোণায় অবস্থিত ডুয়ার্স-অঞ্চলকেও সাহিত্যের আকাশে পেয়ে থাকি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সমরেশ মজুমদার প্রমুখের কথাসাহিত্যে তার নির্জন স্বাক্ষর আছে। তেমনি এই ডুয়ার্স অঞ্চল তথা এখনকার মাটি-মানুষ-প্রকৃতি-পরিবেশ-জীবিকা-ইতিহাস-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-সহ একটি ভূখণ্ডের সামগ্রিক পরিচয় বা রূপ, দেশজ আচার-সংস্কারের বিন্যাস, কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প-উপন্যাসের ভাববস্তু ও রচনারীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশভাক হয়ে উঠেছে।

ডুয়ার্স। যার অর্থ দুয়ার বা দরজা, অর্থাৎ প্রবেশদ্বার। মনে করা হয় পাহাড়ি দেশ ভূটান ও ভারতের প্রবেশ পথে ছোট বড় ১৮টি দুয়ার ছিল, ইংরেজরা সেই দুয়ারকেই বলত ‘ডুয়ার্স’। সম্ভবত বাংলা শব্দ ‘দুয়ার’ এবং ইংরেজি শব্দ ‘Door’ সমার্থক হওয়ায় ব্রিটিশ শাসকরা মুখে মুখে দুই ভাষার এই শব্দের মেলবন্ধন ঘটায়---যা থেকে তৈরি হয় ডুয়ার্স বা Dooars. ভূগোলের মানচিত্রে এর অস্তিত্ব নেই কিন্তু চা-প্রেমী সকল দেশি-বিদেশি মানুষের কাছে পরিচিত শব্দ এই ‘ডুয়ার্স’। তবে ইতিহাসের বহু সংযোজন ও সংকোচন-সম্প্রসারণের ফলে ভূগোলে ম্যাপে এর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে—বর্তমানে বাংলার উত্তরে অবস্থিত একফালি ভূমির সীমানা মোটামুটি দাড়িয়েছে পূর্বে আসাম ঘেষা সংকোশ নদী থেকে পশ্চিমে তিস্তা নদী পর্যন্ত। এই ডুয়ার্স অঞ্চলের আবার দুটি ভাগ রয়েছে —পূর্ব ডুয়ার্স ও পশ্চিম ডুয়ার্স। তোর্ষা নদী ডুয়ার্সকে এই দুটি ভাগে ভাগ করেছে। তিস্তা নদী থেকে তোর্ষা নদী সীমানা পর্যন্ত পশ্চিম ডুয়ার্সের বিস্তৃতি এবং তোর্ষা নদী থেকে আসাম ঘেষা সংকোশ নদী পর্যন্ত পূর্ব ডুয়ার্সের বিস্তৃতি। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি

উত্তর বাংলার এই ডুয়ার্স অঞ্চলে এমন অনেক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে, যারা যুগ যুগ ধরে শত বাধা বিপত্তি, পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতিকূলতা, পরিবর্তনের মধ্যেও স্বজাতির পরম্পরাগত রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, ভাষাচর্চা ইত্যাদির নিরিখে এখনও ‘গোষ্ঠীবদ্ধ’ মনোভাবে জীবনধারণ ও জীবনযাপন করে চলেছে। তাদের যাপিত এই জীবনে জড়িত প্রকৃতি-লগ্ন আদিম সমাজের বিভিন্ন উপকরণ, যা এখনও তার কুমারিত্ব বা মৌলিকতা হারায় নি কিংবা ‘অন্য’ সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে মিশে যায় নি, সেই সমস্ত আদিম উপকরণগুলিকে কৌম বা আদিম জনজাতির উপাদান বলা হয়। এই অঞ্চলে অবস্থিত স্থানীয় আদিবাসী (মেচ, রাভা, খিমাল, বোড়ো, ধাঙুর প্রভৃতি) এবং অভিবাসী আদিবাসী (সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, খাড়িয়া, চিকবরাইক, মালপাহাড়ি প্রভৃতি) প্রধানত কৌম উপাদানের আশ্রয়ে জীবনধারণ করে থাকে। যার জন্য সমীর চক্রবর্তী বলেছেন, ‘আদিম যাযাবরী জীবন পরিত্যাগ করে সব মানুষ একই সময়ে কৃষিজীবীতে পরিণত হয়নি। এই পরিবর্তন এসেছে ধাপে ধাপে আংশিকভাবে। কেউ অনেক আগেই যাযাবরী জীবন পরিত্যাগ করতে শুরু করেছে, কিন্তু অরণ্য ও পশুশিকারের আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ‘কৌম সমাজ ও সংগঠন’ বিনষ্ট করে ফেলেনি। আদিবাসী সংস্কৃতি তাই মূলত লোকসংস্কৃতি হলেও ‘কৌম চেতনা’ই এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য।’^{২২} আবার যারা সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল কিন্তু আদিবাসী নয় বরং ‘অস্ব্যজ’ জাতি হিসাবে রয়েছে, যেমন—রবিদাস, কুমী, ডোম, নমঃশূদ্র, এমনকি রাজবংশী—তাদের জীবনযাপনও কৌমের বৈশিষ্ট্য মুক্ত নয়। তাদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা, পূজা-পার্বণ, খাদ্যাভাস, নাচ-গান প্রভৃতি জীবনযাপনের প্রতিদিনের উপকরণের মধ্যে সেই ছাপ স্পষ্ট। যার জন্য গবেষক সমীর চক্রবর্তী বলেছেন, ‘দ্রাবিড় ভাষাভাষীগোষ্ঠী, প্রোটো-অস্ট্রোলয়েডগোষ্ঠী ও মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী এইসব জনজাতির সঙ্গে রাজবংশী বাঙালির পূজাপার্বণ ও কৌম আচারগত মিল অবিভক্ত বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম ও প্রান্তবর্তী জেলাগুলির বিভিন্ন বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুসন্ধান করলেও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।’^{২৩} তাই বলা যায়, ডুয়ার্স অঞ্চল গাছ-পালা, নদ-নদী, ছোট-বড় ঝোরা-পাহাড় অরণ্য নিয়ে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হওয়ার পাশপাশি মানবজীবনের বৈচিত্র্য নিয়েও তৎপর্যম। এই ডুয়ার্স অঞ্চল যখন সাহিত্যিকদের রচনার প্রেক্ষাপট রূপে চিন্তারাজ্যে ধরা থাকে স্বাভাবিক কারণেই প্রকৃতি ও মানব সম্পদে সমৃদ্ধ ডুয়ার্স সমগ্র রূপে এসে পড়ে। যার কারণে আমরা ডুয়ার্সের এমন সামাজিক পরিবেশ আশ্রয় করে অমিয়ভূষণ মজুমদারের (১৯১৮-২০০১) ‘দুখিয়ার কুঠি’ (পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৫৭, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৫৯) ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ (পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৭৮, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৮১), ‘মাকচক হরিণ’ (১৯৯১), ‘বিনদনি’, দেবেশ রায়ের (১৯৩৬-২০২০) ‘তিস্তাপারের বৃন্তান্ত’ (১৯৮৮), সমরেশ মজুমদারের (১৯৪৪-)- ‘উত্তরাধিকার-কালবেলা-কালপুরুষ’ (১৯৭৯-১৯৮৯) প্রভৃতির মতো কালজয়ী উপন্যাস পেয়ে থাকি। শুধু তাই নয়, তারই প্রবাহধারা বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের অন্যতম কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের লেখনীতেও পাওয়া যায়। তাঁর রচিত ‘ঋ’ (১৯৯৬), ‘মানুষশাবকের কথা’ (১৯৯৮), ‘জর্মের চোখ’ (২০০৬), ‘জোনাকিরা’ (২০০৮), ‘স্বর্গের শেষপ্রান্তে’ (২০১৫), ‘জল ও চুমুর উপাখ্যান’ (২০১৭) প্রভৃতির মতো উপন্যাস এর সার্থক দৃষ্টান্ত।

তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসে ডুয়ার্সের কৌম জীবন ও কৌম জীবনে অভ্যস্ত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত উপাদান প্রধানত দুইভাবে উপস্থাপিত হয়েছে—

প্রথমত, বর্তমান সময়কথা, জীবনযাপনের বাস্তবতা, অন্তর্মুখ সন্ধান তিলোত্তমা, তাঁর আখ্যানে কৌম উপাদানকে, যেমন---প্রথা, মিথ, কিংবদন্তি প্রভৃতি রূপক বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে উপন্যাসের কাহিনি বুনেছেন। যেমন--‘জর্মের চোখ’।

দ্বিতীয়ত, মানবজীবন কথা বলতে গিয়ে সমাজ বাস্তবতা ও জীবনের যে উপলব্ধির কথাই বলা হোক না কেন, তার সঙ্গে ডুয়ার্সের পটভূমিতে প্রবহমান মিশ্র সংস্কৃতির ধারা ও ধারাবাহিকতা পরিস্ফুটনে তিনি, বিভিন্ন কৌম জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন তথা বৃহত্তর অর্থে তাদের ইতিহাস-প্রথা-সংস্কৃতির নানা স্তর ও দ্যোতনা তুলে এনেছেন আখ্যানের খাঁজে-ভাঁজে। যেমন---‘স্বর্গের শেষপ্রান্তে’ উপন্যাস দাঁড়িয়ে আছে ছোটদের চোখে দেখা বড়দের রহস্যময় জীবন সন্ধান। কিন্তু ডুয়ার্সের বালিবিচি চা-বাগান তার পটভূমি হওয়ায় গুঁরাও, মুণ্ডা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র নৈপুণ্যের সঙ্গে আখ্যানে ব্যবহার করে তিলোত্তমা মজুমদার, নিজের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট করেছেন।

...এবারে আমরা তাঁর উপন্যাসে যেভাবে কৌম সমাজের বিচিত্র উপাদান শৈল্পিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে এবং রচনাকে কীভাবে স্থান-কাল উৎকীর্ণ করেছে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

ডুয়ার্সের আদিবাসী চা-শ্রমিকদের মধ্যে চা-গাছের জন্ম নিয়ে প্রচলিত এক বৌদ্ধ মিথ কাহিনি অবলম্বনে তিলোত্তমা মজুমদার রচনা করেছেন ‘জর্মের চোখ’ (২০০৬) উপন্যাস। এই মিথ কাহিনির সত্যতা সম্পর্কে সমীর চক্রবর্তী বলেছেন— ‘বুধিমালা নামে কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অনিদ্রারত গ্রহণ করে তপস্যায় রত হয়েছিলেন। কিছুদিন তপস্যা করার পর তিনি আর চোখ খুলে রাখতে পারলেন না, একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজের ব্যর্থতার জন্য রাগে দুঃখে নিজের চোখের পাতা দুটি কেটে ফেলে দিলেন। আর অমনি ঐ চোখের পাতা থেকে তৈরি হল একটি গাছ, যার পাতা গরম জলে সেদ্ধ করে ঐ জল পান করলে আর ঘুম আসতে পারে না। সন্ন্যাসী বুধিমালা এর নাম দিলেন চা।’^{৪৮} সমীর চক্রবর্তী ইতিহাসের তথ্য এনে দেখিয়েছেন খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যারা যারা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ‘বোধিধর্ম’ ছিলেন অন্যতম ব্যক্তি, যার সঙ্গে বুধিমালার সাদৃশ্য রয়েছে। আর ‘ধর্ম’র উচ্চারণ বিকৃতি ‘জর্ম’ কিনা এ বিষয়ে গবেষকদের সন্দেহের কথাও জানিয়েছেন যাকে নিয়ে চীনদেশে চা গাছের জন্ম ও চা পাতার প্রথম ব্যবহার তাকে নিয়েও মিথ কাহিনির প্রচলন রয়েছে। লেখিকা চায়ের প্রথম ব্যবহারের কাহিনি নিয়ে প্রচলিত এই কাহিনিকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে বর্তমান জীবনালেখ্য লিখেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লেখিকা উপন্যাসের শুরুতেই সেই মিথ কাহিনির বর্ণনা দিয়েছেন ‘শেষ পর্যন্ত রাজকুমার জর্ম ধর্ম যাত্রায় দূরগামী হওয়াই মনস্থ করলেন। তাঁর লক্ষ্য চীনদেশ।’^{৪৯} তারপর ডুয়ার্সে চা-বাগানের পত্তনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন, চা-শ্রমিকদের শোষণের চিত্র বর্ণনা করেছেন এবং মাটিবাড়ি চা-বাগানের অতীত-বর্তমানের প্রেক্ষাপটে বিজু-কমল-পিয়ালি-বুলুদের জীবন আখ্যান রচনা করেছেন। মহাপুরুষ জর্মই যেন উপন্যাসের কমল, যে মহাপ্রাণ জর্মের মতোই চিরকালের শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত আদিবাসী চা-শ্রমিকদের মধ্যে জ্ঞানের আলো, নিজ অধিকারবোধ জাগানোর তপস্যায় রত। একদা তপস্যায় রত জর্ম যেমন কেটে ফেলেন ক্লান্তিতে বুজে আসা চোখের পাতা আর সেই পাতা থেকেই জন্ম নেয় চা নামক গাছ যার পাতার রস সকলের ক্লান্তি দূর করতে সক্ষম তেমনি কমলের আকস্মিক মৃত্যু ও তারই ফলশ্রুতি যেন লাগাতার শ্রমিক ধর্মঘট ও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে চা-বাগানের আপাত শান্তিস্থাপন— যার জন্য বিজুর লেখা ও ছিঁড়ে ফেলা সেই কাগজকুচি যেন মনে হয় কমলেরই চোখের পাতা। যাতে লুকিয়ে রয়েছে আরো সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যবান চা গাছ তৈরি হবার সম্ভাবনা--‘বিজু হাসল। তাকাল আকাশের দিকে। ভোর স্পষ্ট হচ্ছে। তার ভালো লাগছে। সে এখন নিশ্চিত, এইসব চোখের পাতার থেকে আবার জন্ম নেবে অধিক স্বাস্থ্যবান চা-গাছ।’^{৫০} —এইভাবেই লেখিকা নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের ও সমাজের মধ্যে প্রচলিত এই উপাদান ব্যবহার করে শাসক-শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত বর্তমান ঘুমন্ত, নির্জীব, অসহায় সমাজব্যবস্থার ঘুম ভাঙ্গাতে চেয়েছেন।

ডুয়ার্স এমন এক অঞ্চল যা জঙ্গল, ঝোরা, হ্রদ, খাল-বিল, বৃক্ষ নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে রহস্যময় সৌন্দর্যে ঘেরা। প্রাকৃতিক এইসব উপাদানের উৎপত্তি নিয়েও মানুষের মধ্যে কৌতূহলের সীমা নেই। যার সমস্তর উৎপত্তির পিছনে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ‘সত্য-মিথ্যা ও সম্ভাবনা’ কে আশ্রয় করে প্রচলিত রয়েছে বিভিন্ন কিংবদন্তি, তেমনি এক কিংবদন্তিকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন ‘স্বর্গের শেষপ্রান্তে’ উপন্যাসে। লেখিকা বলেছেন বালিবিনি চা-বাগানের আদিবাসী চা-শ্রমিকেরা জঙ্গলের ধারে থাকা গভীর এক কুয়োকে বলে ‘ডোম্বীতাল’। তাদের ডোম্বীতাল নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তি হল—‘মদেশিয়ারা বিশ্বাস করে, এই জায়গাটা স্বর্গের টুকরো। এখানে শিব আর পার্বতী ডোম্ব আর ডোম্বী হয়ে জলকেলি করত। ডোম্বীদেবী ভক্তের পরিব্রাতা আবার শিব পার্বতী খেলা করত বলেই এখানে জলের উপর মুখ বাড়ালে যে যাকে ভালোবাসে তার মুখ দেখতে পায়। প্রেমিক-প্রেমিকারা এখানে ভালোবাসা যাচাই করতে আসে।’^৭

উপন্যাসে বহুবার এই কিংবদন্তির প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রের আলাপ আলোচনায়, দেখতে যাওয়ার প্রসঙ্গে এই কিংবদন্তির কথা এসেছে। কিন্তু কেন? আসলে লেখিকা এই কিংবদন্তি ব্যবহার করে মানবমনের চিরন্তন এক রহস্যকে জীবন্ত করে তুলেছেন। প্রতিটি মানুষ চায় তার ভালোবাসার মানুষের চোখে তার প্রতি ভালোবাসার পরিমাণ যাচাই করতে। কিন্তু জীবন এবং সমাজ আত্মসর্বস্বতার চিত্র, হিংসা, দ্বেষ নিয়ে এতটা প্রকট যে কে কাকে কতটা ভালোবাসে বা বাসে কিনা এই প্রশ্ন সংশয়ের। তবুও মানুষ আপ্রাণ চেষ্টায় অন্যের চোখে নিজের প্রতি ভালোবাসা খুঁজে ফেরে, অগাধ বিশ্বাস নিয়ে ভরসা করতে চায়। মানবজীবনের এই সত্যই ব্যঞ্জিত হয়েছে ‘ডোম্বীতাল’ এ। উপন্যাসের চরিত্রেরা রিনি, বিনি, পল্টু, কালুয়া, এমনকি দীপ্তেনও তাই বারবার ডোম্বীতাল বেড়াতে যেতে চেয়েছে, প্রত্যেক বার মুখ বাড়িয়েছে অন্যের প্রতিবন্ধ দেখতে কিন্তু দেখতে পায় নি। তাই কালুয়া উপলব্ধি করেছে—‘যে প্রেম এমনকি নিজের চেয়েও বড় করে তোলে প্রেমাম্পদকে—তেমন বিরলতম ভালোবাসার জনও আসলে কোনও প্রতিবন্ধ দেখতে পাবে না।’^৮ এই উপলব্ধি সত্ত্বেও তাদের কাছে পরম আকর্ষণ এই ডোম্বীতাল। তাই উপন্যাসের শেষেও তারা কবে দেখতে যাবে তার প্রসঙ্গ এসেছে। এভাবেই বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত উপাদান লেখনী শক্তিতে সর্বজনীন মাত্রা পেয়েছে।

আমাদের নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে ডুয়ার্সের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনে জড়িত উপাদান কেবল রূপক বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয় নি। বরং এই অঞ্চলকে পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত করতে, প্রবাহিত মানবজীবনের মূলস্রোতের পাশে তাদের স্বতন্ত্র জীবনযাপন ও সংস্কৃতি, তার বিবর্তন, সমাজ সভ্যতায় তার প্রভাব আলোচনা সূত্রেও ব্যবহার করেছেন। যা আলোচনা করলেই স্পষ্ট হবে।

ডুয়ার্সে অবস্থিত সাঁওতাল, গুঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি প্রান্তিক মানুষেরা প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুভব করে। তাই এরা এখনও প্রকৃতির গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, মাটি- আকাশ, সূর্যের সমস্ত উপাদানকে পবিত্র জ্ঞানে, শ্রদ্ধা সহকারে, কৃতজ্ঞ চিত্তে পূজা করে থাকে। উপন্যাসগুলিতে তেমনি কিছু বৃক্ষপূজা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। তাদের দেবতা মারাংবরু, বোঙ্গা, জাহের এরা প্রভৃতি প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন- ‘শারহুল উৎসব’, ‘করম পূজা’, ‘জিতিয়া পরব’, ‘এরংকশিম পূজা’। শারহুল প্রধানত মুণ্ডাদের উৎসব, কিন্তু এখন সাঁওতাল ও গুঁরাওরা এই পূজা করে থাকে। এই পূজা না হলে সাঁওতাল, মুণ্ডারা শাল ফুল, মহুয়া ফুল স্পর্শ করে না, পরেও না। গুঁরাওরা এই পূজা না করলে ভূমি কর্ষণ করে না। লম্বা সময় ধরে এই অঞ্চলের মদেশিয়াদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে বৃক্ষপূজা করম গাছের পূজা বা করম জাওয়া বা করম পরব বা করমসুন বা জিতবাহন পূজা। ‘স্বর্গের শেষপ্রান্তে’ উপন্যাসে আদিবাসী চরিত্র

সোমারি ও বুখলা গুঁরাওয়ের সূত্র ধরে এইসব পূজা-পার্বণ সম্পর্কে জানতে পারি। পূজা পার্বণগুলি যে একে অপরের মধ্যে আদান প্রদান সূত্রে প্রাপ্ত —এই সত্যও প্রকাশিত হয়েছে বুখলা গুঁরাও এর কথায়— ‘এরংকসিম পূজা ঠিকঠাক হলে মারাংবুর, জাহের এরা, মঁড়েকো দেবতারা খুশি হয়ে বৃষ্টি দেয়। তারা থাকে পাহাড়ে পাহাড়ে, মেঘে মেঘে, জমির আলে, মাটির ভিতর, জমিজমার চারিদিকের চারসীমায়। এছাড়া আছে করম পূজা। জিতিয়া পরব। ভাদরে করম পূজা শুরু হয় আর আশ্বিনের দিন জিতাষ্টমীর ব্রতপালন। কি বলব মাইজি, মানুষ কেন কোন পূজা করে, নিজেই ভালো জানে না। করম পূজা করলে চাষবাস ভালো হবে, জিতিয়া করলে শস্যও ফলবে, বাচ্চা-কাচ্চাও হবে। এরংকসিম আগে শুধু সান্তালরা করত। এখন আমরাও করি। আমরা করম জাওয়া করি ভাদুইয়ের শুক্লা একাদশীতে, মুণ্ডারা করে করমসূন। ওদের করম শীত বসন্তের উৎসব। তাতে কি? কামনা তো সেই একই। যেন ভালো শস্য হয়। সন্তান-সন্ততি ভালো থাকে। দেবতারা প্রসন্ন থাকে।’^৯ আজ তারা চা-শ্রমিক। ফলে জীবন নিয়ম এবং সময়ের গণ্ডিতে বাধা। তাই বন-জঙ্গল থাকলেও শিকারে যেতে পারে না, চাষ বাস করার জমি পায় না। কিন্তু তবু তারা পূর্বপুরুষের করে আসা এইসব পূজা-পার্বণগুলি ভুলে নি। বিশ্বাস- সংস্কার থেকে সরে আসে নি।

ডুয়ার্সে এইসমস্ত প্রান্তিক মানুষেরা মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ- কবজ, ওঝা- কবিরাজ-ডাইন, গাছ-গাছড়া, জড়িবিউটিতে বিশ্বাস করে। তাই দেখা যায়, বুখলা মৃত বাখের নখ, চুল সংগ্রহ করেছে তাবিজ বানাবে বলে। সোমারি ঝিনির শুভ কামনায় ধনেশ পাখির পালক ছুইয়ে দিয়েছে। আদিবাসীরা রেবেকা মুণ্ডাকে ডাইন ভেবেছে। এরা ভূতে বিশ্বাস করে। উপন্যাসগুলিতে ব্যবহৃত মন্ত্র তার পরিচয় বহন করে, যা তাদের মধ্যে প্রচলিত নিজস্ব ভাষা মুণ্ডারি এবং সংযোগকারী ভাষা ‘সাদরী’ তেই উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন—

(ক) পলায়ন রত সাপকে ধরার মন্ত্র—‘উয়ার বাক্কো গুয়ার বাক্কো

হট্টর মট্টর মাটি’’^{১০}

(খ) ভূত তাড়ানোর মন্ত্র—

‘ছন ছন করুয়া ছন ছন দাড়ি

বাম হাতমে সোনে কাটারি’’^{১১}

(গ) সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র—

‘শিরি শিরি শিবশঙ্কর গুরু

মহাতপস্বী একইশো চন্ডী

ষোড়ে পাট নাওলাখ...’’^{১২}

মন্ত্রগুলির ব্যবহার তাদের আদিম বিশ্বাসকে যেমন তুলে ধরেছে তেমনি এসব মন্ত্র যে বাঙালি জীবনকে প্রভাবিত করেছে তার দৃষ্টান্ত বহন করেছে। কেননা আমরা দেখি, এইসব মন্ত্রের প্রতি কালিকাপ্রতাপ, সুপূর্ণা, ঝিনি, বিজু সকলের বিশ্বাস জন্মেছে এবং সেই আগ্রহ থেকে শেখার প্রবণতাও তৈরি হয়েছে এবং শিখেছে।

ডুয়ার্সের এইসব মানুষের জীবনে অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে জড়িত রয়েছে গান, নাচ। ‘ডমকচ’ গান নামে এক বিশেষ ধরনের গান প্রচলিত রয়েছে এখানকার গুঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডা, খারিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে। সমীর চক্রবর্তীর কথায় ‘দুঃখ-বেদনা, শোক-তাপ, বিরহ, ব্যর্থতা, মৃত্যু, কঠোর জীবন সংগ্রাম এই সব বিষয় নিয়ে রচিত হয় ‘ডমকচ’ গান। একথায় দুঃখের গান ডমকচ গান। অনেক সময় মহাকাব্য বা পৌরাণিক ঘটনা বা চরিত্র, ডমকচ গানে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ডমকচের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানব-মানবীর হৃদয়ের আর্তির প্রকাশ।’’^{১৩} তেমনি একটি সাদরী ভাষায় (বাংলা, হিন্দি মিশ্রিত একটি ভাষা, যা এই অঞ্চলের অভিবাসী এইসব আদিবাসীরা ব্যবহার করে থাকে) রচিত ‘গান

বাংলা অর্থসহ ‘স্বর্গের শেষপ্রান্তে’ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে ‘একে জাগা জনম পালি/ বাড়লি যনে তনে/ জিতিয়া পতইয়া লেখে/ ভেলি ছিতি ছান।/ আয় গেলয় আন্ধিধুকা/ গির গেলয় খেড় কুটা/ শুখা পতইয়া লেখে/ ভেলি ছিতি ছান।’^{১৪}

অর্থাৎ ‘সব ভাইবোন আমরা এক জায়গায় জন্মেছিলাম। কিন্তু বড় হতেই জীবনে এল অন্ধকার বাড়। খড়কুটোর মতো ছত্রাখান হয়ে গেলাম আমরা। শূকনো পাতার মতোই ঝরে গেলাম।’^{১৫} দূরে শীতের সন্ধ্যায় জুট লাইন থেকে ভেসে আসা এই গান বিনিকে তার মৃত দিদির স্মৃতি, মৃত বন্ধু পল্টুর স্মৃতিতে জড়িয়ে দেয়। ভুতকে পল্টুর কুকুর শেরুর স্মৃতিতে জড়িয়ে নেয়। তেমনি সাধারণ পাঠককে জীবনের কঠিন সত্য অনুধাবনে একাত্ম করে দেয়। তাই গানটি একটি গোষ্ঠীর ব্যক্তিক হৃদয়ের উপলব্ধি হয়েও হয়ে ওঠে সর্বজনীন।

এছাড়াও বিবাহ, বিভিন্ন পূজা, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করেও গানের ব্যবহার রয়েছে। গুঁরাও সম্প্রদায়ের বিবাহরীতির ‘বর দেখাউনি’ পরবের তেমনি তাদের একটি ব্যবহৃত গান হল- ‘এহেন বিশিকি নায়ো/ নেও পুত্রিয়ার ভানু/ হন্যে মালা বাঃ নায় দীয়া গো।’^{১৬} এটি একটি বড় গান, যার বাংলা অর্থও তুলে দিয়েছেন লেখিকা ‘আমায় তুমি বিকিয়ে দিলে মাগো/ অনেক দূর গভীর নির্জনে/ অলুক্ষণে এমন কথা/ আনতে নেই মনে।/তোর আপনজনা রইল আগে পিছে/কেন তুই এমন করে কাঁদিস মিছেমিছে?...’^{১৭} গানটি মা ও মেয়ের, পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই বেদনা সর্বস্তরের মা-মেয়ের বিচ্ছেদ বেদনাকেই প্রকাশ করেছে।

তিলোত্তমা মজুমদার বাস্তব জীবনের রূপকার বলেই গুঁরাও সম্প্রদায়ের বিবাহরীতি, অতিথি আপ্যায়নের বিশেষ দিক তুলে এনেছেন। গুঁরাওদের মধ্যে বাড়িতে অতিথি এলে একটি থালায় জল নিয়ে অতিথির পা ধুয়ে দিয়ে গামছা দিয়ে মুছিয়ে সেই জল ঘরের চালে ছিটিয়ে দেবার রীতি রয়েছে। ‘স্বর্গের শেষপ্রান্তে’র বিনি ও দীপ্তেন মউলের বিয়েতে অতিথি হয়ে গেলে যা দেখতে পেয়েছিল এবং নিজেরাও সেভাবে আপ্যায়িত হয়েছিল।

এসকল নির্বন্ধগত ও প্রয়োগকলামূলক উপাদান ছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির যে সব বস্তুগত কৌম উপাদান পাওয়া যায় সেগুলি হল---

খাদ্য : মেটে আলু, কচু পাতা, কুঁদরি, ভুট্টা, কন্দ, গোরুর খাবার ভুসির মন্ড, পোস্তি, শুটকি, পিলুয়া, চিড়ে, খিচড়ি, সাপ, ব্যাঙ, বাঁশের গায়ে লেগে থাকা আঠা।

অস্ত্র : তির, ধনুক, বল্লম, হাঁসুয়া, কুকরি, ফারুয়া, লাঠি, প্রভৃতি।

তৈজসপত্র : মাটির হাড়ি, টোকরি, বাঁশের বুরি, ডিবরি (কুপি) প্রভৃতি।

লোকনেশা : হাঁড়িয়া, ছাঙ, বিড়ি, গাঁজা, মছয়া, চুল্লু।

যানবাহন : গোরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি।

ঔষধ পত্র : রক্তপাত থামাতে— পোড়া ন্যাকড়ার ব্যবহার, গাঁদা পাতার রসের ব্যবহার।

উকুন তাড়াতে— পান পাতার রসের ব্যবহার।

কৃমি দমনে— আশ শ্যাওড়ার পাতার ব্যবহার। ইত্যাদি।

রক্তপাত বন্ধে— পোড়া ন্যাকড়ার ছাইয়ের ব্যবহার। গাঁদা পাতার রসের ব্যবহার।

মাথা পরিষ্কার করতে— রিঠা সেদ্ধ জলের ব্যবহার।

সর্দি-কাশির উপশমে— বাসক, তুলসী, দারুচিনি, লবং, তেজপাতা, গোলমরিচ, আদা আর মিছরি দিয়ে তৈরি পাচনের ব্যবহার।

লোকাভরণ: প্রকৃতির ফুল, পাতা আদিবাসীদের সৌন্দর্যচর্চায় ব্যবহৃত হয়। এরা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পশু, পাখি, জীবজন্তু প্রভৃতি অঙ্কিত চিত্র কপালে, গায়ে, পায়ে আঁকে (সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাওরা)।

শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষা, দারিদ্র্য, বিবাহ, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এমনকি পাশাপাশি ভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস প্রভৃতির কারণে সময়ের সাথে সাথে এইসব সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির মধ্যে সংকরায়ন ও বিবর্তনের দিকটিও তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসে স্পষ্ট। যেমন- কৌম জীবনে অভ্যস্ত আদিবাসীরা সময়ের পালাবদলে আজ শিক্ষিত হচ্ছে ফলে মন্ত্র-তন্ত্রের উপর বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষিতরা তাদের জাতিকে আলোর পথে আনতে তন্ত্র, মন্ত্র, ওঝা, কবিরাজ, বাঁড়-ফুক থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। ‘জল ও চুমুর উপাখ্যান’ উপন্যাসে সেই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উপন্যাসে দেখা যায়, আদিবাসীরা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস দূর করার জন্য সংগঠন গড়ে তুলেছে। সেই সত্য প্রকাশিত পুন্টনের কথায়---‘ওদের সঙ্গে বসে দু’পান্তর হাঁড়িয়া না খেলে ওঝাগুলান যে মুখ খুলতেই চায় না। এদিকে ঐ বস্তিতে আমার যত বন্ধু শনিচর, দুখিয়া, এতোয়ার, স্টিফেন ওরা কেউ ওঝার বাড়ফুক বিশ্বাস করে না। সব শিক্ষিত ছেলে, কলেজ যাচ্ছে, আমাকে বলে, ‘পুন্টন, এসব কী! বাড়ফুক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লাইনে আমরা প্রচার চালাচ্ছি আর তুই শালা ওঝার সঙ্গে চুতিয়াগিরি করছিস?১৮ বাঙালির সংস্পর্শে থেকে আদিবাসী নারীরা ব্লাউজ পরতে শিখেছে, পরিপাটি হয়ে থাকতে শিখেছে, সাবান ব্যবহার করতে শিখেছে। যেমন---‘স্বর্গের শেষপ্রান্তে’ উপন্যাসের সোমারি, বুখলা, বেরেকা; ‘জর্মের চোখ’ উপন্যাসে সোমারি। এরা অন্য সম্প্রদায়ের কাছে আগে দাদা, কাকা সম্বোধন পেত না, কিন্তু এখন তারা শিক্ষিত হয়েছে বলে বাঙালিরাও কাকা, বাবু সম্বোধন করে। যেমন---রেবেকা মুণ্ডাকে কাকিমা বলে এবং চা-বাগানের বাবু হওয়ায় পিটার মুণ্ডাকে পিটারবাবু বলে। আদিবাসীদের মধ্যে জন্মবার অনুযায়ী নাম রাখার রীতি রয়েছে। যেমন---সোমারি, এতোয়া, শনিচরা ইত্যাদি। কিন্তু বাঙালির সংস্পর্শে থেকে থেকে তারাও বর্তমানে নাম রাখার রীতি পরিবর্তন করে নিয়েছে। যেমন---সঞ্চয়, রেবেকা, বুল্টি। স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তারা সচেতন হয়েছে, কারণ এখন তারা হাসপাতালমুখী হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে বাঙালিরা আদিবাসীদের সংস্পর্শ থেকে মদ, হাঁড়িয়া, বিড়ি খেতে শিখেছে, তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, তাদের নাচ-গানে আশ্বস্ত হয়েছে। যেমন- বাঙালি পুন্টন, বিজু আদিবাসীদের সংস্পর্শে থেকে মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে মন্ত্র শিখেছে। মুকুন্দ মুণ্ডারি গীত গেয়েছে, নাচে পরবে অংশ নিয়েছে। বাঙালিরা নাকি এদের সংস্পর্শে থেকে থেকে গালিগালাজ শিখেছে, উলকি পরতে শিখেছে। পিয়ালি বিজুকে এবং রিনি তার দাদাকে তাই বলেছে।

এভাবেই তিলোত্তমা মজুমদার ডুয়ার্সের সামাজিক পরিবেশকে তথা কৌম জীবনে অভ্যস্ত জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতিগত উপাদানকে কোথাও রূপক বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে বর্তমান জীবনালেখ্যে লিখেছেন। কোথাও তাদের স্বতন্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়, উদারতা তুলে ধরতে, কোথাও ডুয়ার্সকে জীবন্ত করতে, সমাজ সভ্যতার বিবর্তনকে দেখাতে উপাদানগুলির ব্যবহার করেছেন। যা বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি তিলোত্তমার শিল্পী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেছে। সমাজ সভ্যতা যতই পরিবর্তিত হোক মানুষ তার আদিম ঐতিহ্যজাত উপাদান সমূহকে আঁকড়ে ধরেই সমান্তরালভাবে আধুনিক জীবনধারায় এগিয়ে চলছে— তার সত্যতা তিলোত্তমা মজুমদারের লেখনী প্রতিভাত করেছে। আধুনিক জীবনের পাশে প্রান্তিক এইসব মানুষের জীবনের মর্মস্পর্শী উত্থাপন সূত্রে তিনি মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে সাম্য স্থাপনের বার্তা দিতে চেয়েছেন। যা একটি বিশেষ অঞ্চলের বিষয় হয়েও জীবনবোধের গভীরতায় অতিক্রম করেছে আঞ্চলিকতা।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়. কু. (২০১২). সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা : রত্নাবলী, পৃ. ২৫৩-২৫৪
২. চক্রবর্তী. স. (১৯৯২). উত্তরবঙ্গে আদিবাসী চা-শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা : মনীষা, পৃ. ১৪৯
৩. তদেব, পৃ. ২৫৩
৪. তদেব, পৃ. ৮
৫. মজুমদার. তি. (২০০৯). জর্মের চোখ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৭
৬. তদেব, পৃ. ২০৭
৭. মজুমদার. তি. (২০১৭). স্বর্গের শেষপ্রান্তে, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৫৫৯
৮. তদেব, পৃ. ৫৬০
৯. মজুমদার. তি. (২০১৭). স্বর্গের শেষপ্রান্তে, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ২৫
১০. তদেব, পৃ. ১৫০
১১. তদেব, পৃ. ২৬৯
১২. মজুমদার. তি. (২০০৯). জর্মের চোখ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১০৫
১৩. চক্রবর্তী. স. (১৯৯২). উত্তরবঙ্গে আদিবাসী চা-শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা: মনীষা পৃ. ২২৮
১৪. মজুমদার. তি. (২০১৭). স্বর্গের শেষপ্রান্তে, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৬৮৭-৬৮৮
১৫. তদেব, পৃ. ৬৮৭-৬৮৮
১৬. তদেব, পৃ. ৫৭৬
১৭. তদেব, পৃ. ৫৭৬
১৮. মজুমদার. তি. (২০১৭). জল ও চুমুর উপাখ্যান, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৩৩

সহায়ক গ্রন্থ :

- (১) ঘোষ আনন্দ গোপাল, কার্তিক সাহা। ২০১৩। ১৯৪৭- পরবর্তী উত্তরবঙ্গ-১, শিলিগুড়ি, এন, এল পাবলিশার্স।
- (২) চক্রবর্তী সমীর, ১৯৯২। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা-শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা, মনীষা পাবলিশার্স।
- (৩) চক্রবর্তী বরশকুমার, ২০১৫। লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।
- (৪) দেবসেন সুবোধ, ২০১০। বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।
- (৫) নাথ প্রমোদ, ২০১৪। প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের জনজাতি, কলকাতা, অর্পিতা প্রকাশনী।
- (৬) বাল্কে ধীরেন্দ্রনাথ, ২০১৭। আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব., কলকাতা।
- (৭) মজুমদার বিমলেন্দু, ২০২০। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী, কলকাতা, গাঙচিল।
- (৮) রাণা সন্তোষ, রাণা কুমার, ২০১৮। পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী, কলকাতা, গাঙচিল।
- (৯) সেন শুচিত্রত, ২০২১। ভারতের আদিবাসী, কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশন।
- (১০) সেনগুপ্ত চন্দ্রমল্লী, মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০১।

সহায়ক গ্রন্থাগার :

- (১) কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার। (২) উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগার, কোচবিহার। (৩) সুভাষ পাঠাগার, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার।

লেখক পরিচিতি:

গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

E-mail: dipikabarainet203@gmail.com.

